হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ইউনিট ৫

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলন প্রকৃত অর্থে ইউরোপের শান্তি আনতে পারেনি। জার্মানির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির অপমানজনক শর্তগুলোকে সামনে রেখে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে তারা। ইতিহাস জয়ীর পক্ষে, পরাজিত শক্তির ক্ষেত্রে সবকিছু হয় নেতিবাচক এ কথাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মহাসত্য। বিশেষ করে প্রচলিত ইতিহাসে জার্মান নেতা হিটলার এবং তার মিত্র ইতালি ও জার্মানির ভূমিকাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় সেখানে মূল ঘটনা অনেকটাই বাদ পড়ে যায়। পরস্পর আক্রমণ প্রতি আক্রমণের প্রচলিত রীতি বাদ দিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিছক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এক্ষেত্রে প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে অক্ষশক্তি ও জার্মান নেতা হিটলারের পৈশাচিক রুদ্রমূর্তি নানা ঘটনার ঘনঘটায় বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব ঘটনার প্রায় প্রতিটিই পরিস্থিতি বিচারে অর্ধসত্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসত্যও বটে। তাই প্রচলিত ইতিহাসের এ বর্ণনাগুলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় পুনঃপাঠ ও তার কার্যকারণ সম্পর্কভিত্তিক আলোচনা করা জরুরি। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা নতুন করে আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে প্রণোদিত করে বিশ্বনেতাদের। বিশেষ করে জার্মানির জন্য অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির পাশাপাশি প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ব্যর্থতা আরেকটি যুদ্ধের পথ করে দেয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রেট ডিপ্রেশন তথা মহামন্দাকেও। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও কারণ বোঝার ক্ষেত্রে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীর ইউরোপের ইতিহাসও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ- ৫.১ মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ- ৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ**
- ✓ **পাঠ- ৫.৩ হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান**
- ✓ **পাঠ- ৫.৪ ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ**
- ✓ **পাঠ- ৫.৫ জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন**

পাঠ-৫.১ মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ১৯২৯ সালের অক্টোবর থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি ছন্দপতন লক্ষ করা গেছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বড় আকারের এই ছন্দপতনকে মহামন্দা তথা দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জার্মানির ধ্বংসস্তূপের বিপরীতে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র। তারা সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে অন্যদের ওপর দাপট দেখাতে শুরু করে। একইসাথে রেনেসাঁ-পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্বে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে পুঁজিবাদ। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মই হচ্ছে এখানে মাঝে মাঝে মন্দাভাব দেখা দেয়। তবে ঝড়ের বেগে এসে এই মন্দাভাব ও পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে গ্রাস করবে, তা ছিল কল্পনাতীত।

হঠাৎ করে সংকট উপনীত হওয়ার অনেকগুলো শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে বেড়ে যায় বেকার ও চাকরি প্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা। ১৯২৯ সালের এই মন্দা অতীতে ঘটে যাওয়া সব ধরনের রেকর্ড ভঙ্গ করে। আর সেদিক থেকে ধরতে গেলে এর মহামন্দা নামকরণ স্বার্থক। এর প্রমাণ হিসেবে এক যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯২৯-৩৫ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস প্রতিবছর পাঁচ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি করত। তবে ১৯৩২-এ দেখা যায় এর গাড়ি নির্মাণের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে গাড়ির চাহিদা না থাকায় এমনটি হয়েছিল। আর তা থেকেই ধরে নেয়া যায় মহামন্দার প্রভাব পুরো বিশ্বে পড়েছিল।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা কারণে মহামন্দা সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পখাতের প্রসার ও এর সাথে পাল্লা দিয়ে পুঁজিবাদের সংকট চোখে পড়ার মত। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্পখাতের গুরুত্ব অনেক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এসময় শিল্পখাতে উন্নয়নকাজ অনেক বিস্তৃত পরিসরে শুরু করে। এদেশের নীতিনির্ধারকগণ শিল্পখাতের বিপর্যয় চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে আরো নানা বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে কৃষিজাত পণ্যের অনর্থক দাম কমানোও মহামন্দার মত ঘটনাকে প্রণোদিত করতে পারে। তবে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই দশক না পেরোতেই ধরা পড়ে ভার্সাই চুক্তির সারশূন্যতা আর লীগ অব নেশনসের অকর্মণ্য অবস্থান। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নতুন করে কেঁপে ওঠে আরেক দফা আক্রমণ আর হত্যাযজ্ঞের মর্মন্তুদ ঘটনায়। এরপর ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেছে ৬ বছর ১ দিন। তারপর আবার শান্ত হয়ে আসে ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা কিংবা আটলান্টিক অঞ্চলের পাশাপাশি আফ্রিকার নানা স্থান। সেই অক্ষশক্তি জার্মানের পক্ষে এবার যোগ দিয়েছে ভিন্ন মিত্র ইতালি, জাপান, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া আর বুলগেরিয়া। আর যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের মিত্রবাহিনীতে এবারের বড় আকর্ষণ রাশিয়া। রুশপন্থী ইতিহাসবিদদের ক্রমাগত পুঁজিবাদ ভর্ৎসনা আর অতিরঞ্জিত বিবরণ থেকে বোঝা কঠিন হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসলে অক্ষশক্তি-মিত্রশক্তির মধ্যে হয়েছে, নাকি রুশ বনাম পুরো বিশ্ব হয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয় অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তির মধ্যে। আর এবারে মিত্রশক্তির পুরোভাগে ছিল রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স চীন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিল। ফলাফলটা শেষ পর্যন্ত এবারও বিপক্ষে গেছে অক্ষশক্তির।

মিত্রশক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাশিয়ার নেতৃত্বে জোসেফ স্ট্যালিন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান, যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল, চীনের চিয়াং কাইশেক, ফ্রি ফ্রান্স আন্দোলনের নেতা দ্য গল ফরাসিদের নেতৃত্বে রয়েছেন। থার্ড রাইখ সরকারের প্রধান, নাৎসি বাহিনীর পুরোধা, এসএস এবং এসএ ফোর্সের উদ্ভাবক, জার্মানির বহুল আলোচিত-সমালোচিত নেতা অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন অক্ষশক্তি তরফে নেতৃত্বের পুরোভাগে। ইতালির ফ্যাসিস্ট পার্টি নেতা বেনিতো মুসোলিনি এবং জাপানের সম্রাট হিরোহিতো ও প্রধানমন্ত্রী তোজো ছিলেন স্ব স্ব বাহিনীর নেতৃত্বে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে বলতে গেলে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে বিশ্বজনীন রূপ লাভ করে যখন জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসে। এরপর হিরোশিমা নাগাসাকিতে বর্বর আক্রোশে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপ ১৯৪৫ সালে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এরই মাঝে জার্মানি আত্মসমর্পণ করলে একটি গোপন বাংকারে আত্মহননের মাধ্যমে জীবনের সব গ্লানি মুছতে চেষ্টা করেন অ্যাডলফ হিটলার। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্যালেন্ডারের পাতায় দুই দশকের বেশি সময় পার হয়নি; ঠিক ১৯৩৯ সালেই শুরু হয়ে যায় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। আর ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর প্রায় ১৬ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। এর বাইরে ৪৫ লাখের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়।

পাঠ- ৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী কারণ সামনে রেখেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণকে এক এবং একমাত্র বলে দায়ী করা যায় না। এর পেছনে দীর্ঘমেয়াদে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে তিনটি ঘটনা সবার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২০ সালের দিকে ইতালির ফ্যাসিজম, ১৯২০ সালের দিকে জাপানি সামরিকবাদের বিকাশ এবং ঠিক তার এক দশকের মাথায় ১৯৩০ সালে চীন আক্রমণকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। পাশাপাশি ১৯৩৩ সালে এসে জার্মানিতে উদ্ভব ঘটে কুশলী রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের। যাকে বিশ্বের বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ ঘৃণ্যতম স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তবে ইতিহাসের বাস্তবতায় হিটলার ছিলেন একটি উপলক্ষ মাত্র, যিনি ১৯৩৩ সালের দিকে নাৎসি পার্টির নেতা হিসেবে জার্মানির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ভার্সাই চুক্তির অপমানজনক শর্তগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে জার্মানিকে নতুন উদ্যমে মাথা তুলে দাঁড়াতে প্রণোদিত করেন।

১৯৩৯ সালে জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণগুলোকে দার্শনিক, অর্থনীতি সম্পর্কিত ও বিশেষ কয়েকটি দিক বিচারে আলাদা করা যেতে পারে। যেমন মতাদর্শ, শাসনকাঠামো কিংবা দার্শনিক দিক থেকে চারটি কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ (Anti-communism), সম্প্রসারণবাদ (Expansionism), সামরিকবাদ (Militarism) ও বর্ণবাদ (Racism)। অন্যদিকে ভার্সাই চুক্তি একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ভার্সাই চুক্তির প্রতি পরবর্তীকালে জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজার দখলের লড়াই, লীগ অব নেশন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, ম্যাসন-ওভেরি তত্ত্ব (The Mason-Overy Debate) যা যুদ্ধের প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রণোদিত করে। এর পাশাপাশি আরো কিছু সরাসরি কারণ ছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করে।

সরাসরি বলতে গেলে জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর নেতা হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ, ইথিওপিয়ায় ইতালির আক্রমণ এর সবকিছুই আরেকদফা মহাযুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে বিশ্বকে। পাশাপাশি প্যান জার্মানিজমকে সামনে রেখে তৈরি মতবাদ (Anschluss), মিউনিখ চুক্তি, সোভিয়েত-জাপান সীমান্ত বিরোধ, ডানজিগ সংকট, মিত্র পক্ষের সাথে পোল্যান্ডের সংযুক্তি উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালে। অন্যদিকে মলটোভ-রিবেনট্রপ সংকট আরো তীব্রতা পেয়েছে ততদিনে। ধীরে ধীরে ক্ষমতা ও প্রভাববলয় বাড়িয়ে তোলা জার্মানি এবার আক্রমণ করে বসে পোল্যান্ডে। শক্তিশালী সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা এতদিনে আগ্রাসী রূপ লাভ করে। ঠিক তেমনি মুহূর্তে জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ আরেকদফা যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করে বিশ্বকে।

সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ (Anti-communism)

১৯১৭ সালে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতায় আসে বলশেভিক দল। এই দলের নেতারা সমাজতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। যে বিপ্লব রাশিয়ায় সফল হয়ে জার ক্ষমতার পতন ঘটিয়ে শ্রমিক দলকে ক্ষমতায় বসাতে পেরেছিল। তারা চেয়েছিলেন পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যাক এই মতবাদ। বিশ্বের অন্যদেশ তাদের এই মনোভাব ভালোভাবে নিতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্বের যে দেশেই অনেকটা বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে রাশিয়া সেখানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছে। তারা বিপ্লবী জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র থেকে শুরু করে আর্থিক সহায়তা দিতে কার্পণ্য করেনি। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাশিয়াবিরোধী অবস্থান তুঙ্গে ওঠে। রাষ্ট্রগুলো চেয়েছিল যেভাবেই হোক রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে, অন্তত সেটা করা সম্ভব না হলে রাশিয়ার দেখাদেখি তাদের দেশেও জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে রাশিয়া যদি বিদ্রোহী জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তাদের পক্ষে ক্ষমতা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দেখা দেবে। বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ। এ মতবাদ অনেকগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশকে একই পতাকার নিচে একত্রিত হওয়ার পথ করে দেয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রসারণবাদ (Expansionism) : একটি নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টাকে সম্প্রসারণবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতালির শাসন ক্ষমতায় এসে বেনিতো মুসোলিনি চেষ্টা করেছিলেন নতুন করে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। এক্ষেত্রে পূর্বে রোমানদের অধীন দেশগুলোতে ইতালির আগ্রাসন সম্ভাব্য হয়ে দেখা দেয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তারা ১৯৩৯ সালে আলবেনিয়া আক্রমণ করে, গ্রিসের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি

১৯৩৫ সালে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে বসে। এ বিষয়গুলো লীগ অব নেশনসের নীতিমালাবহির্ভূত কাজ। এমনি আগ্রাসী চিন্তা দ্রুতই একটি বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে যা জার্মানির সরাসরি ভূমিকায় বাস্তব রূপ লাভ করে।

সামরিকবাদ (Militarism) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধ শুরুর বেশ আগে থেকেই সশস্ত্র শান্তির যুগে একের পর এক বিস্তৃত হতে থাকে সামরিকবাদ। প্রতিটি দেশ আর্থিক দৈন্য উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ করে তোলে সামরিক বাহিনীর আকার। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের সেনাবাহিনীর ট্রেনিং নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর এক দশক আগে থেকে অনেকগুলো দেশে সামরিক বাহিনীর আকার বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সমরসজ্জা বাড়িয়ে তুলতে দেখা যায়। সেনাবাহিনীর এই আকৃতিগত সম্প্রসারণ তাদের নতুন করে আরেকটি যুদ্ধে জড়িত হতে প্রণোদনা দেয়।

বর্ণবাদ (Racism)

জার্মানি ও ইতালির একত্রীকরণ ইউরোপে রাজনীতির প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয়। তারা প্রথমে নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হয়, পরে আত্মপ্রকাশ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসেবে। শেষ পর্যন্ত প্যান জার্মানিজম মতবাদের আওতায় তারা প্রকাশ ঘটাতে থাকে নানা ন্যক্কারজনক চিন্তা চেতনার। এদিকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালির মত দেশগুলোও বর্ণবাদী চিন্তায় পিছিয়ে থাকেনি। পাশাপাশি সোশ্যাল ডারউইনিজমের চিন্তা একবার বিস্তৃতির সুযোগ হলে তা ছড়িয়ে পড়ে বেশ দ্রুত। এর প্রভাবে প্যান শ্লাভিজম, প্যান ইতালিজম, প্যান জার্মানিজম প্রভৃতি চিন্তাকে উসকে দেয়। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মত বিষয়গুলো এ মতবাদকে প্রণোদিত করে। ধীরে ধীরে অভিবাসন অঞ্চল ধরে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা পেয়ে বসলে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে।

ভার্সাই চুক্তির দুর্বলতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ভার্সাই চুক্তির দুর্বলতা ও জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়া ফ্রান্সের প্রতিশোধপরায়ন শর্তগুলো। এ চুক্তি এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যে যেকোনোভাবে জার্মানি যাতে ঘুড়ে দাঁড়াতে না পারে। শেষ পর্যন্ত জার্মানি নিজেদের দুরবস্থার কথা বুঝতে পারে এবং সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উড্রো উইলসনের ১৪ দফাকে সামনে রেখে এমন কিছু শর্ত এখানে চাপিয়ে দেয়া হয় যা ক্রমাগত জার্মানির দারিদ্র্য ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তোলে। এদিকে বিশ্বের নানা স্থানে থাকা জার্মান উপনিবেশগুলোও তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হয়। এতে আর্থিক দিক থেকে ক্রমশ নাজুক অবস্থানে চলে যেতে থাকে তারা।

ফ্রান্সের নিরাপত্তানীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ফ্রান্স তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অদ্ভুত কিছু দাবি উত্থাপন করে। আপাত দৃষ্টিতে পুরোপুরি অবাস্তব মনে হলেও শক্তিবলে মিত্রশক্তি এ দাবিগুলো জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়। এতে করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা যতটুকু নিশ্চিত হোক আর নাই হোক অন্তত জার্মানি ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে সামরিক বাহিনী সংকোচনের পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী বিলুপ্তির দাবি জাতি হিসেবে জার্মানির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে। এর জন্য তাদের মধ্যে একটি প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছে শুরু থেকেই। এদিক থেকে ধরলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে জার্মানিকে শায়েস্তা করার যে পথ মিত্রবাহিনী অবলম্বন করে তা থেকেও যুদ্ধ অনেকটা আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এর পরের বছর ১৯১৯ সালে বসানো হয় প্যারিস শান্তি সম্মেলন। নামের দিক থেকে একে প্যারিস শান্তি সম্মেলন বলা হলেও এতে আদৌ কোনো শান্তি আসেনি। উপরন্তু এতে নতুন অশান্তির বীজ উপ্ত হয়েছে ইউরোপে। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয় জার্মানির ওপর। আর তারা এজন্য দোষী সাব্যস্ত করে নানা দিক থেকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। একটি শান্তি প্রস্তাবনার কথা বলা হলেও সেখানে পরাজিত শক্তিকে উপস্থিতই থাকতে দেয়া হয়নি। এর থেকে তাদের মধ্যে প্রতিশোধপ্রবণতা তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে রাইনল্যান্ডের কয়লাখনির ওপর ভাগ বসিয়ে মিত্রবাহিনী জ্বালানি শক্তি এবং অর্থনীতি দুদিক থেকেই জার্মানিকে পঙ্গু করে তোলার চেষ্টা চালায়। এ ধরনের বিষয়গুলো পরবর্তীকালে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। আর তা থেকে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জার্মানির প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে অনেকগুলো চুক্তির পাশাপাশি এমন কয়েকটি শর্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা জার্মানির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্যলিপিতে কালিমা লেপন করে। একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলেও জার্মানির মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এসময় বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আপসকামী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি পার্টি। নাৎসি নেতারা জার্মানির মানুষকে বুঝিয়ে বৈপ্লবিক অবস্থানে নিয়ে যায়। তারা পুরো জার্মানিকে বোঝাতে সক্ষম হয় তাদের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য লেজ গুটিয়ে থেকে অপমানজনক শান্তির পথ বেছে নেয়ার চেয়ে সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। জনগণ তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শ্রদ্ধা দেখায়। নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসে হিটলার নেতৃত্বাধীন নাৎসি পার্টি। গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় এলেও অল্পদিনের মধ্যে পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোয় জার্মানির শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে কালবিলম্ব করেননি হিটলার। তার ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে সব ধরনের অন্যায় চুক্তির প্রতি জার্মানির বিরোধী অবস্থান লক্ষ করা যায়। নানা ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে হিটলার সরকারের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আসন্ন করে তোলে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার

ইউরোপের দেশগুলো বিশ্বের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার পাশাপাশি বাণিজ্য বিস্তার শুরু করে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির বিভিন্ন স্থানের খনিজ সম্পদের উপরেও ভাগ বসায় তারা। এতে করে ইউরোপে এক ধরনের অর্থনৈতিক অসাম্য তৈরি হয়। জার্মানি নিজেদের দেশে অবস্থিত খনি থেকে উত্তোলন করা জ্বালানি তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এ থেকে সুবিধা নিয়ে অর্জিত শক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। এদিকে সাখালিন দ্বীপের তেলের খনির দখল নিয়ে জাপানের সাথে সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণকে সে দফায় ঠেকিয়ে দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় তাদের অগ্রগতি রোধ করতে সক্ষম হয় জাপান। এরপর ১৯৩১ সালের পর থেকে জাপান এশিয়ার একাধিপতি হিসেবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলতে প্রয়াসী হয়। ১৯৩৭ সালের দিকে বৃহত্তর এশিয়া বাণিজ্যিক অঞ্চল নিশ্চিত করতে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসে জাপান। এসময় ঘটে যায় কুখ্যাত 'নানকিং ম্যাসাকার' নামে গণহত্যার ঘটনা। এভাবে নানা সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আভাস লক্ষ করা যায়।

জাতিপুঞ্জের সমস্যা

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নানা দিক থেকে সমস্যায় জর্জরিত ছিল। অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নিরাপত্তা, কূটনৈতিক পরিসর কিংবা সমরনীতি সব দিক থেকেই অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে তোপ দাগার প্রবণতায় মনোযোগী ছিল এ সংগঠনটি। জার্মানি ও তার মিত্ররা এই নীতির অসারতা শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমে তারা দুর্বল থাকায় সরাসরি এর বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। পরে ধীরে ধীরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে বিরুদ্ধ অবস্থান নেয়। একের পর এক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জাতিপুঞ্জকে একটি পঙ্গু সংগঠন হিসেবে প্রমাণ করে তারা। ফলে অলীক শান্তির বাণী শুনিয়ে যে কাল্পনিক প্রতিষ্ঠান মিত্রবাহিনী দাঁড় করিয়েছিল তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। এতে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ আসন্ন হয় যা বুঝতে কারো বাকি থাকেনি।

ম্যাসন-ওভেরি বিতর্ক (The Flight into War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে ম্যাসন ওভেরি বিতর্ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। এক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের দিকে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রিচার্ড ওভেরি (Richard Overy) ও টিমোথি ম্যাসনের (Timothy Mason) মধ্যে যে তর্ক হয় সেখানে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ লাগার নানা কারণ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে ম্যাসন মনে করে একটি কাঠামোগত আর্থিক সংকটই হিটলারকে এই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। তবে ওভ্যারি তার থিসিসে এ বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যদিও জার্মানিতে আর্থিক সংকট চলছিল তা পোল্যান্ডে আক্রমণ চালানোর মত ঘটনাকে সমর্থন দেয় না। এক্ষেত্রে ঘরে বাইরে একনায়কের দাপট প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার জন্য তিনি জার্মানিতে গড়ে ওঠা নাৎসি স্বৈরতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। সব মিলিয়ে তাঁদের গবেষণা ও বিতর্কিত অবস্থান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কারণগুলো সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

বেনিতো মুসোলিনি

উদারপন্থী শাসনের নামে পুরো ইতালিতে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ইতালির জন্য এমনি এক আপত্তিকর মুহূর্তে এগিয়ে আসেন বেনিতো মুসোলিনি। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতে গিয়ে জীবনের ঘানি টানতে ব্যর্থ মুসোলিনি চলে যান সুইজারল্যান্ড। তারপর দেশে ফিরে তিনি গঠন করেন আধাসামরিক এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম ফ্যাসিস্ট পার্টি। এ বাহিনী তাদের নেতা মুসোলিনির বক্তব্যকেই নীতি ও আদর্শ হিসেবে মেনে প্রাচীন ইতালির সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসোলিনি একটি শক্তিশালী সামারিক দল গঠন করেন। ১৯২২ সালের দিকে হাজার হাজার ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রাজধানী রোমের পথে রওনা হন মুসোলিনি। তখনকার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলস বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেও তারা তার নির্দেশ মানেনি। এরপর ক্ষমতায় চলে আসেন ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতা মুসোলিনি। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসলেও সময়ের আবর্তে তিনি এক প্রভাবশালী স্বৈরশাসক বনে যান। তার নেতৃত্বেই ইতালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। প্রথম দিকে জার্মানি একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিলেও তিনি নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তিনি চেষ্টা করেন নতুন করে ইতালির সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো যায় কি না সে বিষয়ে।

রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ

অপমানজনক ভার্সাই চুক্তিকে ঘোষণা দিয়ে অস্বীকার করে থার্ড রাইখ তথা হিটলার নেতৃত্বাধীন নাৎসি সরকার। ১৯৩৬ সালের মার্চের ৭ তারিখে রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ করে জার্মানি। এখানকার স্ট্রেসা ফ্রন্ট তার ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে ছিল। পশ্চিম জার্মানির ঠিক সে স্থানে জার্মান সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে যা ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘনের শামিল। তখনকার ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের তাঁর জীবনীতে লিখে গেছেন এখানে সেনা সমাবেশ শুধু ভার্সাই চুক্তির লঙ্ঘনই না, পাশাপাশি নতুন এক জার্মানির উত্থানবার্তা সবার কাছে জানান দেয়া।

ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ

স্ট্রেসা সম্মেলন শেষ হলে ইতালি তার প্রভাববলয় বিস্তৃতির চেষ্টা চালায়। অ্যাংলো-জার্মান নেভাল এগ্রিমেন্ট ইতালির শাসক বেনিতো মুসোলিনিকে আফ্রিকা অভিমুখে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথ দেখায়। এ পরিস্থিতিতে লীগ অব নেশনস ইতালিকে একটি আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে দেশটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বলে সবাইকে। ইতালি কোনো নিষেধাজ্ঞার ধার না ধেরে আক্রমণ পরিচালনা করে একের পর এক ভূখণ্ড দখল করতে থাকে। তারপর ৭ মে ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া দখল করে তিনটি দেশ একত্রিত করে ইতালিয়ান ইস্ট আফ্রিকা নামে একটি উপনিবেশ পত্তন করে। এরপর ১৯৩৬ সালের ৩০ জুন সম্রাট হাইলে সেলাসি ইতালির কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে লীগ অব নেশনসে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসোলিনি লীগ অব নেশনস থেকে তার দেশের সদস্যপদ প্রত্যাহারের কথা সাফ জানিয়ে দিতে একটুও সময় নেননি। এর ফলে নতুন করে উত্তপ্ত হয় ইউরোপ।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

নন্দিত শিল্পী পাবলো পিকাসো তার বিখ্যাত জার্মেনিকা চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেন ১৯৩৭ সালের দিকে। এখানে নাৎসি বাহিনীর নানা আক্রমণের দৃশ্য তুলির আঁচড়ে তুলে আনার একটি প্রচেষ্টা ছিল। তবে এ চিত্রকর্মটির থিম এতটাই বিচিত্র সেখান থেকে সারবস্তু খুঁজে বের করা বেশ কষ্টকর। স্পেনের দুটি পক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে গৃহযুদ্ধের উপক্রম হলে জাতীয়তাবাদী সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোকে অ্যাডলফ হিটলার ও বেনিতো মুসোলিনির পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া হয়। অন্যদিকে স্প্যানিশ রিপাবলিকের পক্ষে লড়তে থাকা পক্ষকে সমর্থন দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৩৬ থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এমনি নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে স্পেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ধীরে ধীরে স্পেনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ইতালি-জার্মান পক্ষে বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এ ঘটনাও তখনকার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করেছিল।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ

আগ্রাসী জাপানি রাজতন্ত্র চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার শাসনকাজে একজন পুতুল শাসককে বসায়। এরপর ১৯৩৭ সালের দিকে মার্কোপলো সেতু দুর্ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। জাপান চীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

স্থানে একের পর এক বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ১৯৩৭ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাপান চীনের সাংহাই, নানকিং, গুয়াংঝাউ ও বেজিংয়ের নানাস্থানে বোমাবর্ষণ করে। এসময়েই জাপানের রাজকীয় বাহিনী (Imperial Japanese Army) নানকিংয়ের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধ ঘটিয়েছিলো। তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার পাশাপাশি তাদের লালসার শিকার হয় কয়েক লক্ষ নারী। এঘটনা এশিয়ার শান্তি বিনষ্ট করে।

আনস্কুলস (Anschluss)

১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়ার বাহিনী জার্মানির একটি বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নেয় যাকে আনস্কুলস (Anschluss) নামে অভিহিত করা হয়। প্যান জার্মানিজম মতবাদ জার্মান জাতিসত্তার অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষকে একই ভৌগোলিক পরিসরে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক মানচিত্রের অধীনে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখায়। এ উপলক্ষেই হিটলারের নাৎসি বাহিনী কাজ শুরু করে। তারা সবার আগে স্ট্রেসা ফ্রন্ট থেকে ১৯৩৫ এর দিকে যে অস্ট্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসে। পাশাপাশি তাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রোম-বার্লিন সমঝোতা বৃদ্ধি করে। পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হলে জার্মানি বাহিনী অগ্রসর হয়ে অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর ধীরে ধীরে অস্ট্রিয়ার পক্ষের শক্তিগুলো নিজেদের অবস্থান জানান দিতে বাধ্য হলে জার্মান-ইতালি ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়; যা আরেকটি যুদ্ধেরও প্রস্তুতিও বটে।

মিউনিখ চুক্তি

চেক প্রজাতন্ত্রের সীমান্তঘেঁষে অবস্থিত সুডেটারল্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্মান অঞ্চল। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে মিত্রবাহিনী এ অঞ্চলকে জার্মানির থেকে কেড়ে নিয়ে নবগঠিত চেকোস্লোভাকিয়া তথা বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রকে দান করে। জার্মান নেতা হিটলার এটা মেনে নিতে না পেরে ১৯৩৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিনের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেকোনো মূল্যে সুডেটার জার্মানির দখলে নেয়ার হুমকি দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তার পাশাপাশি চেকোস্লোভাকিয়ারও একটি শক্তিশালী সেনাদল ছিল। তারা এগুলো কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ অবস্থায় ১৯৩৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর করা হয় মিউনিখ চুক্তি। ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারেননি হিটলার কতবড় দাবি জানাতে পারেন। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার শান্তি নিশ্চিতকল্পে জার্মান বাহিনীর অবস্থান আরেকটি বিস্তৃত বিপদের ইঙ্গিত বয়ে আনে। ধীরে ধীরে এ মিউনিখ চুক্তিই জার্মান সমরবাদকে আরো আগ্রাসী করে তোলে।

শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা

জার্মানি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারা ১৯৩৯ সালে মিউনিখ চুক্তি ভঙ্গ করে প্রাগ আক্রমণ করে। এসময় স্বাধীন শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে ওই অঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের রাজনীতি করার আর কিছুই থাকেনি। ফলে ধীরে ধীরে তারাও যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়।

ইতালির আলবেনিয়া আক্রমণ

বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বাধীন ইতালি একের পর এক বিশ্বের নানা দেশে আক্রমণ করতে থাকে। তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নীতির অংশ হিসেবে ১৯৩৯ সালের ২৫ মার্চ তিরানায় গিয়ে ইতালির বশ্যতা স্বীকার করার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয় মুসোলিনি বাহিনী। তারপর ৭ এপ্রিল ১৯৩৯ আলবেনিয়া আক্রমণ করে ইতালির বাহিনী। মাত্র তিনদিনের লড়াইয়ে আলবেনিয়ার পতন ঘটে।

খালখিন গলের যুদ্ধ

রাশিয়া ও জাপানের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে খালখিন গলের যুদ্ধ বাধে। এর আগে ১৯৩৮ সালে খাসান লেক অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জাপান রাশিয়া একদফা লড়াই হয়েছিল। কিন্তু এবারের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যে লড়াই তা পূর্বের সব ধরনের যুদ্ধের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। জর্জ ঝুকভের নেতৃত্বাধীন রুশ বাহিনী এগিয়ে যায় জাপানিদের প্রতিরোধ করতে। এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলার পর ১৯৪৫ সালে সন্ধির মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল এ যুদ্ধের।

ডানজিগ সংকট

চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রভাব বিস্তারের পর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যরা বুঝে যায় এবারের থার্ড রাইখ জার্মানির ফুরার হিটলার কারো সাথে আপস করতে আসেনি। হিটলার যেকোনো মূল্যে জার্মান দখলদারিত্বকে আরো বিস্তৃত করতে চাইবেন সেটা

বুঝতেও আর কারো দেরি ছিলো না। কিন্তু ততদিনের জার্মানি অনেক শক্তিমত্তা অর্জন করেছে। বলতে গেলে বিভিন্ন সেক্টরে সেই অজেয় জার্মান বাহিনীকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন ফুরার হিটলার। বাল্টিক অঞ্চলের দিকে ধীরে ধীরে থার্ড রেখ সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় ডানজিগ সংকট। মূলত ডানজিগ শহর মুক্ত করা নিয়ে যুদ্ধ বাধে এবার। ক্ষমতায় আসার পর নাৎসি সরকার পোল্যান্ডের সাথে যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছিল তা এ যুদ্ধে মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়।

মিত্রবাহিনীর সাথে পোল্যান্ডের সখ্য

ক্ষমতায় আরোহণের পর হিটলারের নাৎসি সরকার পোল্যান্ডের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা জার্মানির শত্রুদের সাথে হাত মিলালে হিটলারের বাহিনী থেমে থাকেনি। ১৯৩৯ সালের মার্চে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা মিলিতভাবে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এক্ষেত্রে দেশটির ওপর হিটলার দাবি জানালে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে যায়।

রাশিয়ার পোল্যান্ড অভিযান

মলোটোভ-রিবেনট্রপ প্যাক্টের জন্য রাশিয়ার পোল্যান্ড অভিযান ইতিহাস বিখ্যাত। এক্ষেত্রে লড়াই বেশিদূর এগোনোর আগেই দুপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। এসময় স্বাক্ষর করা হয় বিখ্যাত একটি চুক্তি। ২৩ আগস্ট ১৯৩৯, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভায়েশ্লেভ মলোটোভ (Vyacheslav Molotov) এবং জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াকিম ফন রিবেনট্রপ (Joachim von Ribbentrop)-এর মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিতে নির্ধারণ করা হয় আপাতত রাশিয়া কিংবা জার্মানি কেউ কারো ওপর আক্রমণ করবে না। অন্যদিকে সেনা সমাবেশ থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক তৎপরতা বেড়ে যায় বিশেষ কারণে। আর এই তিক্ততা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় বিশ্বযুদ্ধে।

পাঠ-৫.৩ হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে চারদিক থেকে ধেয়ে আসা নিষেধাজ্ঞার বাণ আর অবরোধের পর অবরোধ জার্মানিকে কোণঠাসা করে রাখে। আশৈশব উন্নত ও শক্তিশালী জার্মানির স্বপ্ন দেখা যুবক অ্যাডলফ হিটলারের উত্থান একটি পর্যায়ে এসে পুরো বিশ্বকে আবার উত্তপ্ত করবে এমন আশঙ্কা করেছিলেন অনেক তাত্ত্বিক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নিষ্পেষিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত হওয়া জার্মান যুবকের প্রতিচ্ছবি হিটলার শৈশব থেকেই বেড়ে ওঠেন তীব্র ইহুদি বিদ্বেষ নিয়ে। জার্মান পরিবারগুলোর হতশ্রী দশার পাশাপাশি তাদের সম্পদেই ইহুদিদের আয়েশ তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি পুঁজিপতি ইহুদি আর তাদের তোষণকারীদের জব্দ করার জন্য উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদী আদর্শে গড়ে তোলেন নাৎসি দল। পরে এ দলটির ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে নতুন দিনের পথে পা বাড়ায় জার্মানি। যে নতুন নিয়ে ভালো-মন্দ যত তর্কই থাকুক না কোন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর কারণ হিসেবে হিটলারের উত্থান ইতিহাসানুক্রমে অনেক গুরুত্বের দাবিদার।

হিটলার নাৎসি বাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। ১৯৩৩-৩৪ সালের মধ্যে নাৎসিরা পুরো জার্মানির উপর তাদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে তারা পরিস্থিতির দায় মেনে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে। পাশাপাশি তারা শুরু থেকেই ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একের পর এক তার শর্ত ভঙ্গ করতে থাকে। ইহুদি পুঁজিপতিদের সম্পদ সরকারি হুকুমে বাজেয়াপ্ত করা শুরু করে নাৎসি সরকার। এদিকে নতুন উদ্যোমে পুনর্গঠন শুরু হয় জার্মান সামরিক বাহিনীর। হিটলার ঘোষণা করেন কোনো মনেই নাৎসিরা দুর্বল জার্মানিকে দেখতে চায় না। তাদের দলের মূলমন্ত্র হচ্ছে এমন এক জার্মানি প্রতিষ্ঠা করা যার সামনে সবাই সম্মানে মাথা নোয়াবে। দেশের অভ্যন্তরে নাৎসিদের সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায় সব কথার শেষ কথা। জার্মানির বিরুদ্ধে অবস্থানরত দেশগুলোকে শায়েস্তা করার নানা আয়োজন চলতে থাকে পুরোদমে। শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী তৈরির পাশাপাশি ঢেলে সাজানো হয় বিমান বাহিনীকেও। নতুন প্রযুক্তির বিভিন্ন বিমান সংযুক্ত করে পুরো আধুনিক একটি বাহিনীতে রূপ দেয়া হয় তাদের। ধীরে ধীরে সমরসজ্জা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার এক পর্যায়ে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে বসে জার্মানি।

প্রথম জীবনের একজন স্কুল শিক্ষক নাকি সেনাবাহিনীতে যোগদানের ভয়ে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে সেই লোকটি যে কিনা আবার সাংবাদিকতাও করেছে। পরবর্তী জীবনের সাথে শুরুর দিকের মুসোলিনির সাথে অন্য কারো তুলনা করা কঠিন। ১৯০২ সালে যে মুসোলিনি সুইজারল্যান্ডে চলে যান আবার ২ বছরের মাথায় ১৯০৪ সালেই ফিরে আসেন দেশে। প্রায় ১০ বছর সাংবাদিকতা করে সম্পাদক বনে যান অ্যাভান্তির নামে একটি পত্রিকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হটকারীভাবে মিত্র বাহিনীর পক্ষাবলম্বন তাঁকে হতাশ করে, তিনি সমাজতান্ত্রিক থেকে পুরোদস্তুর ডানপন্থী হয়ে যান। এরপর ১৯১৫ সালে তিনি ত্যাগ করেন সমাজতান্ত্রিক দল। সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দক্ষতা দেখিয়ে একজন কর্পোরাল পদে পদোন্নতি হয় তাঁর। জার্মান নেতা হিটলারের মত তিনিও যুদ্ধ চলাকালীন আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন মিলানে। তারপর বিভিন্ন ডানপন্থী দলের সদস্যদের একত্রিত করে গঠন করেন ফ্যাসিস্ট পার্টি।

১৯২২ সালে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিকদের দাপট কমাতে রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল ফ্যাসিস্ট পার্টিকে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেয়। ক্ষমতায় গিয়ে দোর্দণ্ডদাপটের সাথে মুসোলিনি বামপন্থীদের ওপর চড়াও হন। এ সময় ১৯২৪ সালে হত্যা করা হয় গিয়াকমো মিত্তিওতিকে। তার ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় ১৯২৯ সালে একদলীয় সরকার হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্ট পার্টি। মুসোলিনির প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৯৩৬ সালের দিকে জার্মানির সাথে ইতালি একটি মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বলতে গেলে এর পরবর্তী ৫ বছর না যেতে ১৯৪১ সাল নাগাদ ইতালি পুরোপুরি জার্মানির ওপর নির্ভরশীল একটি বন্ধুরাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে একজন শক্তিশালী নেতা হিসেবে মুসোলিনির উত্থান নিশ্চিত হয়ে যায় ১৯৪০ এর মধ্যেই। ১০ জুন পরলোকগত পোপ দ্বিতীয় পলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রোমে যে ফলক নির্মাণ করা হয় তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। সেদিন ইতালি ইঙ্গ-ফরাসি জোটের বিরুদ্ধে ইতালির সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার তীব্র আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনতা মুসোলিনির এ ঘোষণাকে হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালে অনেকটাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন তিনি।

ইঙ্গ-ফরাসি জোটের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির সাথে কোনো ধরনের আপস না করে উপরন্তু তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে শুরু করেন জার্মান নেতা হিটলার। এর ফলে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তবে যুদ্ধ শুরুর প্রথম ১০ মাস তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি ইতালি। তারা এককথায় বলতে গেলে নীরব থেকে যায়। তবে পরিস্থিতি হঠাৎ করে বদলে যাওয়ায় জার্মানির সমর্থনে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয় ইতালি। ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সামনে অনেক সমস্যা

এসে হাজির হয়। তারা নিরাপত্তা প্রশ্নে অনেকটা ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকা ও নিকটপ্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েন করে যা ইতালির যুদ্ধে যোগদানকে অনেক দিক থেকে বৈধতা দিতে পারে। ইতালির রণতরী থেকে শুরু করে ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজারগুলো নৌপথে তাণ্ডব তুলে। তাদের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরদিন ব্রিটিশ বোমারু বিমান থেকে আসমারা ও মাসোয়াতে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ শুরু করে। যুদ্ধ চলে সিসিলিসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। তবে যুদ্ধে মার্কিনিদের অংশগ্রহণ একে একে সিরাকিউস, পালাজ্জলো, অগাস্টা এবং ভিজনির পতন নিশ্চিত করে। শেষ পর্যন্ত ফিল্ড মার্শাল মন্টেগোমারির বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে জার্মান ও ইতালির বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। জার্মান বাহিনী দ্রুত ভেঙে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ এপ্রিল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন মুসোলিনি ও তার বান্ধবী ক্লারা প্যাত্তাসি। ক্যাস্ট্রোয় জেনারেল কার্ল উলফ আত্মসমর্পণ করার পর তাদের হত্যা করে চৌরাস্তায় টাঙিয়ে রাখা হয় ক্ষতবিক্ষত লাশ।

পাঠ- ৫.৪ ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ

ব্যাটল অব আল আমিন

দুই ফিল্ড মার্শালের দ্বৈরথ নাকি ব্রিটিশ-জার্মান সংঘাত কি বলে বিবরণ দিলে সবচেয়ে উপযুক্ত উপমার ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে তা বলা কঠিন। মিসরের এখনকার রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় দেড়শ মাইল পশ্চিমে আল আমিন রণাঙ্গনে প্রথমে ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক। দুর্ধর্ষ জার্মান সেনানায়ক মরু শেয়ালখ্যাত ফিল্ড মার্শাল রোমেলের সামনে একের পর এক নাকানিচুবানি খেতে থাকা অচিনলেককে সরিয়ে নেয় ব্রিটিশরা। এরপর কুশলী সমরনায়ক মন্টেগোমারি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। এবার দুর্দিন দেখতে শুরু করে জার্মানরাও। ১৯৪৩ সালের মে মাসে আল আমিন রণাঙ্গনের লড়াইয়ে মিত্রবাহিনীর বিজয় ঘটলে জার্মানরা তাদের আফ্রিকা কোর সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালের দিকে অনেকগুলো রণাঙ্গনে জার্মানির সাফল্য মিত্র বাহিনীকে হতাশ করে। বিশেষ করে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় শক্তি নৌবাহিনী বলতে গেলে জার্মান ইউবোটের আক্রমণে নাকাল হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মরুভূমিতে চলতে থাকা ব্যাটল অব আল আমিন তাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ফিল্ড মার্শাল রোমেল যেভাবে আফ্রিকা কোরকে সাজিয়ে নিয়ে যুদ্ধ জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে পুরো সুয়েজ খাল জার্মানদের দখলে চলে যেত। অন্যদিকে এ লড়াইয়ে জিততে পারলে জার্মানরা নজর দিত তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে যা আস্তে আস্তে পুরো বিশ্বের মানচিত্রই বদলে দিতে পারতো। আর এসব কারণেই ব্যাটল অব আল আমিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এতটা গুরুত্ব পেয়েছে।

ফ্রান্স দখলের ৪৪ দিন

জার্মানির জাতশত্রু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্থানীয় পরিসরে তাদের ক্ষোভটা ফ্রান্সের উপরেই বেশি ছিল। অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে ভার্সাই চুক্তির ন্যক্কারজনক শর্তগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যেকোনো মূল্যে ফ্রান্সকে শায়েস্তা করা হবে। এদিকে ফরাসিরা তখনকার দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলে ম্যাজিনো লাইন। তারা মনে করত আর যাই হোক বিশ্বের কোনো সেনা বাহিনীর পক্ষে এই ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এদিকে সে অসম্ভবকে সম্ভব করে বসে জার্মানির দুর্জয় পাঞ্জার ডিভিশন। তারা সুকৌশলে এই ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে সরাসরি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে উপস্থিত হলে মাত্র চুয়াল্লিশ দিনের মাথায় পতন ঘটে ফ্রান্সের। নরওয়ে অভিযানের ব্যর্থতায় নেভিল চেম্বারলিনকে তুলোধুনো করে ছাড়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আর সে সুযোগটাই নিয়েছিলো হিটলারের বাহিনী। জার্মানরা যে বিদ্যুৎগতির ব্লিৎসক্রিগ অপারেশন চালিয়ে একের পর এক পোল্যান্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করেছিল ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সে অভিযানে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছিল শক্তিশালী ম্যাজিনো লাইন। এক্ষেত্রে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনগুলো ম্যাজিনো লাইন এড়িয়ে বেলজিয়ামের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে প্যারিস দখলের চেষ্টা করে সফলতার মুখ দেখে। এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলো বিখ্যাত 'ম্যানস্টেইন পরিকল্পনা'।

ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা শার্লে দ্য গল

ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অবিশ্বাস্য সফলতা দুর্ভাগ্যের দিন ডেকে আনে ফরাসিদের। এ সময় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন শার্লে দ্য গল। তিনি ১৯৪১ সালের দিকে সুয়েজ খাল অঞ্চলে প্রথম জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। এরপর যখন যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন পুরো জাতির হাল ধরেন তিনিই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তার অধিকারী জার্মান বাহিনীর সামনে যত শক্তিশালীই হোক না কেন সব ধরনের পদাতিক বাহিনী ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। তিনি যখন ফরাসিদের উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অনেকগুলো ফরাসি উপনিবেশ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দ্য গলের চরম বৈরি হলেও ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই তিনি সাক্ষাৎ করেন জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাথে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ পতনের দিনে গল ফ্রান্সবাসীকে মাঠে না নামার অনুপ্রেরণা যোগাতে মার্কিন সহায়তা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। এর ফলে ফ্রান্স একেবারে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন ভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে জার্মানির পরাজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন ফ্রান্স গড়ে তোলার জন্য।

ম্যাজিনো লাইনের লড়াই

ফ্রান্স বুঝতে পেরেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ সম্পাদিত জার্মানির জন্য অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি কোনো যুদ্ধবিরতি নয়, বরং আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষামাত্র। তারা প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু চোখের সামনে প্রত্যক্ষ

করেছিল। ১৯১৯ সালে সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি তাই জার্মানিকে সামরিক-রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিলেও ফরাসিদের স্বস্তি আনতে পারেনি। পল রেনোঁ এবং শার্লে দ্য গলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তখন তৈরি করা দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন। মার্শাল জোফরের পরামর্শে নির্মিত এই লাইন বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে খ্যাত। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আঁদ্রে ম্যাজিনো সরকারকে এ প্রকল্পে রাজি করিয়ে নিজ নামে লাইনটি নির্মাণ করেছিলেন। ম্যাজিনো লাইনে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি পদে পদে বাধা সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাদের দুর্ধর্ষ পাঞ্জার ডিভিশন এক্ষেত্রে তাদের লড়াইয়ের দক্ষতা প্রমাণ করে। তারা ম্যাজিনো লাইন তছনছ করে উপস্থিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। এর মাধ্যমে পুরো বিশ্ব জেনে যায় ময়দানের লড়াইয়ে কতটা শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে গিয়ে উপনীত হয়েছে জার্মানি।

ব্যাটল অব ব্রিটেন

প্রচণ্ড রকমের জাতীয়তাবাদী নেতা হিটলার শুরু থেকেই অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির সবগুলো নীতিকে ভেঙে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। ভার্সাই চুক্তি জার্মানির বিমান বাহিনী ধ্বংস করে তাদের ট্যাংক মোতায়েনের ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। জার্মানি গোপনে তাদের বাহিনী শক্তিশালী করে তোলে। তারা কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে তাদের বিমান বাহিনীকে প্রথম কাজে লাগায়। তারা এর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরে ব্যবহার করে। ১৯৩৯ সালে জার্মান বাহিনী পোল্যান্ডে তাদের বিদ্যুৎগতির ব্লিৎসক্রিগ চালানোর থেকে ব্রিটেনের সাথে যাদের যুদ্ধ আসন্ন মনে করা হয়। ব্রিটিশ সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মানুষজন তাদের বিমান বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারে। বহু নারী-পুরুষ শিশু লন্ডন শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যায়। অনেক মানুষ জীবন রক্ষার্থে তাদের বাগানে বাংকার তৈরি করে। এ অবস্থায় ১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান এসে হাজির হয়। এগুলো বিভিন্ন বিমান বাহিনীর ঘাঁটি থেকে শুরু করে শিল্পাঞ্চলে হামলা করতে থাকে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ দিন রাত সমানে হামলা চলে। এতে ব্রিটেনের সড়ক, রেলপথ, ডকইয়ার্ড থেকে শুরু করে পয়ঃনিষ্কাশন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এভাবে হামলা চলে প্রায় ৫৭ দিন ধরে। যে হামলায় অংশ নেয় ৩৪৮টি জার্মান বোমারু বিমানের পাশাপাশি ৬১৭টি জঙ্গি বিমান। হামলায় বার্মিংহাম প্যালেস থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট হাউজ, ওয়েস্ট মিনস্টার হল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ, ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট এক মূর্তিমান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

অপারেশন ড্রামবিট

ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মনে করা হলেও জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন স্থলপথে তাদের নামের প্রতি সুবিচার করে। এদিকে জার্মানির সুগঠিত বিমান বাহিনীও অন্য সব দেশের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়। এ অবস্থায় জার্মানরা ঘাতক ইউবোটের মাধ্যমে নৌপথেও তাদের শক্তিশালী অবস্থান জানান দেয়। ১২ ডিসেম্বরের দিকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসীমায় ঢুকে পড়ে জার্মান ইউবোটগুলো। অ্যাডমিরাল ডেয়েনিটস মনে করতেন এই ইউবোটগুলো নির্বিঘ্নে নিউইয়র্ক গিয়ে পুরো ডকইয়ার্ডকে তছনছ করে আসতে পারবে। এ সময় সাহসে বলীয়ান হয়ে ইউ-১২৩-এর ক্যাপ্টেন হার্ডেগানের ক্রুরা হামলা করে নোভা স্কটিয়ায় সলিল সমাধি ঘটায় 'সফোক্লেস'-এর। এরপর ১৮ ডিসেম্বর তারা লং আইল্যান্ডের মোন্টাউক পয়েন্ট থেকে মাত্র ৬০ মাইলের মধ্যে আঘাত হানে। এবার ডুবিয়ে দেয় 'নোরনেস'কে। প্রথম দিকে কোনো সুনির্দিষ্ট মানচিত্র না থাকলেও ক্যাপ্টেন হার্ডেগান এভাবে হামলা করতে করতে একেবারে ৩৩০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব থেকে নিউইয়র্কের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। অবাক করার বিষয় হচ্ছে জ্যাকব রিস সৈকতের পাহারায় থাকা মার্কিন রক্ষীরা শুরু থেকে শেষ অবধি অপারেশন ড্রামবিট চালাতে অগ্রসর হার্ডেগানের ইউ-১২৩কে দেখতেই পায়নি।

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বিমান ও নৌঘাঁটি হিসেবে বিখ্যাত পার্ল হারবার। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত সামরিক অভিযান হিসেবে বলা পেতে পারে জাপান সাম্রাজ্যের বাহিনীর পার্ল হারবার আক্রমণ। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও নৌঘাঁটিতে চালানো আক্রমণের মুহূর্তে ছত্রখান হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী। জাপান সাম্রাজ্যের জেনারেল হেডকোয়ার্টারের অপারেশন জেড পরিকল্পনায় একে পরিচালনা করা হয়েছিলে হাওয়াই অপারেশন হিসেবে। ওয়াহো দিনে তখন ছুটির দিন। মার্কিন নৌবাহিনীর প্যাসিফিক ফ্লিটকে নিয়ে আসা হয় জাপানের ওপর অবরোধ আরোপের জন্য। প্রতিশোধ নিতে ৬টি বিমানবাহী জাহাজের সহায়তায় ৩৫৩টি জাপানি যুদ্ধবিমান এবং অগণিত টর্পেডো

একযোগে আক্রমণ করে বসে। তারা পার্ল হারবারের হিকাম সামরিক ঘাঁটি থেকে শুরু করে এ দ্বীপে নোঙর করা মার্কিন জাহাজগুলোর ওপর বৃষ্টির মত বোমাবর্ষণ করে।

জাপানি হামলায় সেখানে থাকা সবকটি মার্কিন জঙ্গি বিমান ধ্বংস হয়। মাত্র কয়েকটি সেখান থেকে উড়ে পালাতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে তাদের ১২টি যুদ্ধজাহাজের একটিও অক্ষত ছিল না। অসমর্থিত তথ্যে তাদের প্রায় ১৮৮টি জঙ্গিবিমান ধ্বংসের পাশাপাশি প্রাণ যায় ২৪০৩ জন মার্কিনর। বিস্ফোরিত হয়ে মার্কিন রণতরী ইউএসএস অ্যারিজোনা ডুবে গিয়ে প্রাণনাশ হয় ১১০০ মার্কিন নৌসেনার। এখনও স্মৃতি হিসেবে এই ইউএসএস অ্যারিজোনার খোল দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাপানিরা মূলত প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনদের দাপট সাময়িকভাবে হলেও কমিয়ে দিতে এ হামলা চালায়। পার্ল হারবারে জাপানি হামলা প্রাথমিকভাবে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত এর ফলাফল ছিল অনেক ভয়াবহ। দ্বিতীয়বারের মত মার্কিন ভূখণ্ডে বহিঃশক্তির সরাসরি বিমান হামলা হিসেবে ঘটনাটি অনেক গুরুত্ব পেয়েছে মার্কিন ইতিহাসে।

মার্কিন-জার্মান দ্বৈরথ

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির দ্রুত পরাজয়ের মূল কারণ মার্কিনদের অংশগ্রহণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের নেশায় উন্মাদ হিটলার ইউরোপের কয়েকটি দেশকে হারিয়েই শান্ত হতে পারেননি। তিনি শুরু থেকেই চেয়েছিলেন তাদের পুরনো শত্রু মার্কিনদের শায়েস্তা করতে। তাই ইউরোপের রণাঙ্গন ছাড়িয়ে এবারের যুদ্ধ পা বাড়ায় আটলান্টিকের দিকে। হিটলার প্রস্তুতি সম্পন্ন মনে করে ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একই দিনে এর পাল্টা জবাব দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বলতে গেলে হাওয়াইয়ের পার্ল হারবারে জাপানি হামলার ঠিক চারদিনের মাথায় শুরু হয় জার্মান-মার্কিন সংঘাত। বাইরের ভূখণ্ডে মরণপণ লড়াই চললেই জার্মান সৈন্যরা মার্কিন ভূখণ্ডে অবতরণ করতে পারেনি। ঐতিহাসিকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিটলারের অনেকগুলো বড় ভুলের একটি।

রাশিয়া অভিমুখে জার্মান বাহিনী

দুই রণাঙ্গনে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দুর্বল দিকগুলো বুঝতে পেরে জার্মানরা ১৯৩৯ সালের আগস্টে রাশিয়ার সাথে একটা ১০ বছর মেয়াদি চুক্তি করে। এক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের ভূমি জবরদখল থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক আরো নানা কারণ নিয়ে চুক্তি হয় রুশ-জার্মান বাহিনীর মধ্যে। তাদের সমঝোতা অনুযায়ীই ১৯৩৯ সালের দিকে রুশরা আক্রমণ করে দখল করে নেয় পোল্যান্ড। এই বছরের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড দখল করলে তাঁর বিরুদ্ধে একইসাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ১৯৪১ থেকে শুরু হওয়া পূর্ব রণাঙ্গনের ভয়াবহ লড়াইয়ে রুশরা একইসাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেয় যা নিঃসন্দেহে নাৎসি জার্মানির মাথাব্যথার হেতুতে পরিণত হয়। তাদের দমন করতে এবার সরাসরি রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন হিটলার। নির্দেশ পাওয়ামাত্র ১৯৪১ সালের ২২ জুন ভোরে ৪০ লাখের মত জার্মান, ইতালীয় ও রুমানিয়ার সৈন্য রাশিয়ায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রেও জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন তাদের অপ্রতিরোধ্য ইমেজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তারা তিনদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করে রুশদের একেবারে বন্দি করে ফেলে। এভাবে একমাস ধরে লড়াই করে জার্মান সৈন্যরা অপ্রতিরোধ্যভাবে লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তবে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, তুষারঝড় এবং শীতল আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনীর এই অগ্রযাত্রা টিকে থাকেনি। আর ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে রুশ প্রকৃতি এবারেও তাদের প্রধান প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ

জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে নেহাত ঠুনকো মনে হয় রুশ বাহিনীকে। প্রকৃতি তাদের সহায় না হলে শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনী তাদের একেবারে কচুকাটা করে ছাড়তো। তবে তাদের চৌকস নৈপুণ্যে সব ধরনের সমস্যা উত্তরণ করে জার্মানরা। বলতে গেলে ১৯৪১ সালে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৯০০ দিন অবরুদ্ধ ছিল এ অঞ্চল। দীর্ঘদিনের অবরোধে প্রাণ যায় প্রায় ৬ লাখ ৩২ হাজার মানুষের। ১৯৪১ সালের বড়দিনে সেখানে অনাহারেই মারা যায় ৪০০০-এর বেশি মানুষ। এই লেনিনগ্রাদ অবরোধ ছিল রাশিয়ায় জার্মানির সর্বাত্মক অভিযানের অংশ। প্রায় ৪০ লাখ সৈন্য নিয়ে বিশাল এ ফ্রন্টে লড়াই শুরু করে শুধুমাত্র জ্বালানি সংকটের কারণে মস্কো অধিকার করতে পারেনি জার্মানরা। রাশিয়ার ভূখণ্ড জার্মান ট্যাংক চলার উপযোগী না হলেও সেখানে তাদের বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু

বছরের শুরুতে অহেতুক গ্রিসে অভিযান চালিয়ে জার্মানরা তাদের শক্তি অপচয় করে বসে। এক্ষেত্রে তারা যদি জনবল অপচয় না করতো, তাহলে এ সময়ে নিশ্চিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটত বলে মনে করেন অনেকেই।

স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ

৪০ লক্ষ জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রায় ৩০ লক্ষের মত রুশ সৈন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা প্রথম দিকে ভালো রকম মার খেলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে জার্মানদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বিরুদ্ধ রাশিয়ার প্রকৃতি যেখানে জার্মানির জন্য বড় বিপদের কারণ সেখানে রুশ বাহিনী নতুন করে সক্রিয় হয়। তাই বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ মনে করেন স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ হিটলারের অনেকগুলো ভয়ানক ভুলের একটি। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজেই নিজের ভয়াবহ পরাজয় ডেকে এনেছিলেন জার্মান নেতা হিটলার। জার্মান বাহিনী একাধারে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইউরোপের লড়ছিল অন্যদিকে পূর্ব রণাঙ্গনের লড়াইও থেমে ছিলো না। এ অবস্থায় স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধের সিদ্ধান্ত হিটলারের জন্য নিঃসন্দেহে হঠকারী হয়ে দেখা দেয়। অন্তত একসাথে এতোগুলো ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা তখন জার্মান বাহিনীর ছিল না।

জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন নিঃসন্দেহে দ্রুত আক্রমণ করে যেকোনো অঞ্চলে দখলে নিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে পারত। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধ শীতল প্রকৃতিতে টিকে থাকার ক্ষমতা বিশ্বের কোনো বাহিনীরই ছিল না। তা জার্মান বাহিনীর স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধের ব্যর্থতায় আরেকবার প্রমাণ হয়ে যায়। স্ট্যালিনগ্রাডে প্রায় ২০০ দিনের অবরোধ চলে প্রথমে জার্মানরা সেখানে অবরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত রাশিয়া সেখানে আরো শক্তিশালী অবরোধ গড়ে তোলে। আক্রমণের ভয়াবহতা আঁচ করে সেখানে আক্রমণের দায়িত্বে থাকা পাউলাসকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেন হিটলার। এর আগে কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করেননি। তবে পাউলাস তার বিধ্বস্ত হেডকোয়ার্টার্সের কাছে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৯৪৩ সালের ২ জানুয়ারি প্রায় ৯১ হাজার জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধের অবরোধকালে মারা যায় লক্ষাধিক জার্মান, তাদের সাথে ছিল প্রায় ৮৭ হাজার ইতালীয় ও লক্ষাধিক রুমানিয়ার সেনা। তবে স্ট্যালিনগ্রাডে রুশ অবরোধের সময় মারা যায় আরো লাখ তিনেক জার্মান সৈন্য। দুর্ধর্ষ ষষ্ঠ জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনকে উদ্ধার করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয় আরো কয়েক হাজার জার্মান সৈন্য। বলতে গেলে স্ট্যালিনগ্রাড অভিযান এক রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ঘটনা।

নরম্যান্ডির ডি ডে ল্যান্ডিং

জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের ভূখণ্ডে দুর্দান্ত হামলা চালিয়ে হিটলারের বাহিনীকে অনেকটাই নাজেহাল করে ছাড়ে মিত্রবাহিনী। ১৯৪৪ সালে নরম্যান্ডি উপকূলে হওয়া এ হামলা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশু পরিণতি কি তা জানান দিতে শুরু করে। তুমুল লড়াইয়ে জার্মানরা ফ্রান্সের ওই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। মিত্রবাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসে সরাসরি এখানে হামলা চালায় যাকে ইতিহাসে ডি ডে ল্যান্ডিং তথা অপারেশন ওভারলোড নামে স্থান দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায় ১২টি দেশের ৩০ লাখ সৈন্য গিয়ে হামলা চালায় নরম্যান্ডিতে। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এই ১২ দেশের সৈন্যরা একসাথে হামলা চালায় ৬ জুন। সেদিন রাতের বেলা ছত্রীসেনা অবতরণ, গ্লাইডার অবতরণ থেকে শুরু করে জঙ্গি ও বোমারু বিমানের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজ থেকে বোমা ও গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। মিত্র বাহিনীর ৩৭ হাজার নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয় দেড় লক্ষাধিক। অন্যদিকে জার্মানদের ২ লক্ষ সৈন্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি ২ লাখ আত্মসমর্পণ করে। তবে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের ৩৫২ তম ডিভিশন এখানে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে জার্মানদের পরাজয় আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাগ্য অনেকটা এখানেই নির্ধারণ করে দেয়।

অপারেশন অগাস্ট স্টর্ম

যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার নৌঘাঁটিতে হামলার পর মিত্রবাহিনীর তরফ হতে যুক্তরাষ্ট্রকে উপযুক্ত জবাব দেয়াটা জরুরি ছিল। ১৯৪৫ সালে জাপানে রুশ হামলাকে অনেকটা জাপানকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টাও বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রুশরা এখনকার মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার মেনজিয়াং, শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অভিযান চালায়। এখনকার চীনের অংশ মাঞ্চুরিয়া তখন জাপান দখল করে নিয়েছিল আর অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে জাপানের উপর প্রথম আঘাতটা

যেদিক থেকে আসে মাঞ্চুরিয়া এর মধ্যে অন্যতম। অনেকগুলো ফ্রন্টে একের পর এক হারতে থাকা জাপানি রাজকীয় বাহিনী শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করত আর যাই হোক অন্তত হোম গ্রাউন্ডে এসে তাদের হারিয়ে দেয়া মিত্রবাহিনীর পক্ষে অতটা সহজ হবে না যতটা না বাইরের ফ্রন্টগুলোতে জয়লাভ করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত চতুর্মুখী হামলার সামনে আর শেষটা সুখকর হয়নি জাপানি রাজকীয় বাহিনীর। সবক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হতে হয় তাদের। আর জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মূলত আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির ট্র্যাজেডি

বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল থেকে শুরু করে বিবিধ আক্রমণ চালিয়ে জাপানের সাথে কিছুতেই পেরে ওঠেনি মিত্রবাহিনী। পশ্চিমে জার্মানদের সাথে তাল মিলিয়ে এশিয়ার রণাঙ্গণে একাই লড়ে যাচ্ছিল জাপানি রাজকীয় বাহিনীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে হামলার জন্য মিত্রবাহিনীর অন্যতম অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের চরম ক্ষোভ ছিল জাপানের ওপর। কিন্তু যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যে এতটা নির্মম ও জঘন্য হবে তা কেউ চিন্তা করতে পারেনি। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনার নজির স্থাপন করে ৬ ও ৯ আগস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয় লিটল বয় ও ফ্যাট ম্যান নামের দুটি ধ্বংসাত্মক আনবিক বোমা। ৬ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হিরোশিমায় প্রথম বোমাটি নিক্ষেপ করা হলে তাৎক্ষণিক প্রাণ যায় ১ লাখ বিশ হাজার মানুষের। আর তার দ্বিগুণ মানুষ মারা যায় এর একটু পরে। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যান আনবিক বোমা নিক্ষেপের এ পাশবিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এনোলা গে নামের বিমানটি থেকে যখন হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করা হয় তখন থমকে গিয়েছে বিশ্ব মানবতা এর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। অন্তত পরপর দুটি আঘাত সইতে না পেরেই জাপানিরা ১৫ আগস্ট এসে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানি যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেও জাপানে সম্রাট হিরোহিতোর বাহিনী ছিল নাছোড়বান্দা। তারা সমান তালে লড়ে যাচ্ছিল মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের দুটি সমৃদ্ধ শহরের এমন করুণ পরিণতি তাদের থমকে দেয় সেখানেই; জাপানিরাও বাধ্য হয় আত্মসমর্পণে।

ব্যাটল অব বার্লিন

বার্লিন পতন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ঘটনা। এক্ষেত্রে লড়াই হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জার্মানের। বলতে গেলে ১৯৪৫ সালের শুরুতেই বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে পিছু হটতে শুরু করে জার্মান সৈন্যরা। তাদের দুর্ধর্ষ পাঞ্জার ডিভিশন হামলা করে অনেক এলাকা দখল করে নিলেও সেটাকে দখলে রাখার মত লোকবল কিংবা সামরিক শক্তি দীর্ঘদিনের যুদ্ধে খুইয়ে বসেছে জার্মানরা। এ অবস্থায় রুশরা অনেকটা মরণকামড় দিয়ে বসে জার্মানিকে। বার্লিন দখল করতে এক সোভিয়েত ইউনিয়নেরই প্রায় ২৫ লাখ সৈন্য এসে উপস্থিত হয়। ৪১ হাজার ৬০০ কামানের পাশাপাশি ৬২২৫টি ট্যাংক থেকে সমানে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে রুশরা। এতেই বলতে গেলে প্রায় ছত্রখান হওয়ার যোগাড় হয় জার্মানদের। তাদের ১০ লক্ষাধিক সৈন্য সেখানে মরণপণ লড়াই করেও শেষরক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে পতন ঘটে বার্লিন নগরীর। আর এক যুগের ত্রাস ছড়ানো থার্ড রাইখের পতন ঘটে এসময়েই।

পাঠ-৫.৫ জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন

লুফটওয়াফ তথা জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিংয়ের চিঠি থেকেই বোঝা যায় জার্মানির ভাগ্য ইতোমধ্যে নির্ধারিত। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না হিটলার। তিনি এ টেলিগ্রামের জবাবে মার্শাল গোয়েরিংকে বরং গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গোয়েরিং ২৫ এপ্রিল ভোরে গ্রেফতার হলে সেদিন একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় জার্মান চ্যান্সেলর হাউসে এসে। জেনারেল রিটার ফন গ্রেইম ও নারী টেস্ট পাইলট হানা রিচ গিয়ে দেখা করেন হিটলারের সাথে। হিটলার গোয়েরিংয়ের পদাধিষ্ঠিত করেন আহত ফন গ্রেইমকে যিনি পরপর তিন দিন বাংকারে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। এর মধ্যেই এসএসের কমান্ডার হেইনরিখ হিমলার একই সাথে মিত্রবাহিনীর সাথে আলোচনা এবং পশ্চিমে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের কাছে জার্মান বাহিনী আত্মসমপর্ণের প্রস্তাব দেন। হিটলার হিমলারের প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারমেন ফেজেলিয়ানকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করেন।

হিটলার নিশ্চিত পরাজয় জেনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর যাই হোক তিনি মিত্রবাহিনীর কাছে অন্তত আত্মসমর্পণ করবেন না। এক্ষেত্রে আত্মহননই হয় তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা এবং এক গৌরমময় পরিণতি। আর তাই হিটলারকে না পেয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে জার্মানির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল। প্রথমে ৪ মে ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টেগোমারি হল্যান্ড, উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ডেনমার্কে অবস্থানরত জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের ৭ মে জেনারেল বোহনি নরওয়েতে সৈন্যদের আত্মসমর্পণের কথা বলেন। এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনে জেনারেল ফার্ডিনান্দ শোরনারের নেতৃত্বাধীন জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। হিটলার ৩০ এপ্রিল তাকে জার্মান বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ পদে ভূষিত করেছিলেন। তারপরেও ১৯৪৫ সালের ৮ মে সব রণাঙ্গন থেকে থমকে যেতে হয়ে জার্মান বাহিনীকে। এসময় আত্মসমর্পণ না করে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত শোরনার অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে জার্মান নেতা হিটলার বার্লিনেই ছিলেন। সেখান থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তিনি নিজেই বলেছে অন্তত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার মত কাপুরুষ অ্যাডলফ হিটলার হয়; তার কাছে যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন এবং যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী জার্মান শ্রেষ্ঠত্বের মহান লড়াই। তিনি ভেবেছিলেন কোনোভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পদানত করা গেলে পুরো বিশ্বই অন্তত একবার জার্মানির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। তবে প্রাকৃতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে রুশরা জয়লাভ করে যুদ্ধ, জীবনের শেষ দেখতে পান অ্যাডলফ হিটলার। পূর্ব প্রুশিয়ার রাসটেনবুর্গ থেকে একটি ব্যর্থ আক্রমণে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান হিটলার। এরপর তিনি অবস্থান নেন বার্লিনের এক ভূগর্ভস্থ বাংকারে। ১৬ জানুয়ারি বাংকারে প্রবেশ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটি বারের জন্যও বাইরে আসার সুযোগ হয়নি হিটলারের। অনেক শক্তিশালী বোমার আঘাতে বাংকারটির কোনো ক্ষতি হয়নি বললেই চলে। পাশাপাশি সেখানে পর্যাপ্ত রসদের যোগানও ছিল। রুশ সৈন্যরা চারদিক থেকে বাংকারটা ঘিরে ফেলছে জানতে পেরে ২২-২৩ এপ্রিল শীর্ষস্থানীয় জার্মান অফিসাররা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে হিটলার সেখানে অবিচল থেকে যান সেই বাংকারে। এই বাংকারেই বিয়ে করার পর ৩০ এপ্রিল স্ত্রী ইভা ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করেন হিটলার। ফুয়েরার বাংকার নামে পরিচিত এ স্থান মাটির প্রায় ৫৫ ফুট নিচে অবস্থিত। প্রায় ৪ মিটার কংক্রিকেটের আস্তরণযুক্ত এ স্থান প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে অবস্থিত। জাপানের আত্মসমর্পণকে মনে করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ের ঘটনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কুখ্যাত ভার্সাই চুক্তি যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ করে দেয় তেমনি বিচারের নামে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল ছিল আরেকটি প্রহসনের নামান্তর। বিজয়ী শক্তি সুযোগ পেলে সবদিক থেকে পরাজিত শক্তির ওপর চড়াও হয় এ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যুদ্ধাপরাধের দায়ে যে ব্রিটিশরা জার্মানদের বিচারের সম্মুখীন করতে থাকে তারাই ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অন্যদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলতে গেলে এক জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপ করে মিত্রবাহিনীর তরফে যুক্তরাষ্ট্র যে অপরাধ করেছিল তার বিচার করে সাধ্য কার। সেদিক থেকে ধরতে গেলে নাজি জাতীয়তাবাদী যোদ্ধাদের বিচার প্রহসন বৈ কিছুই নয়। এক্ষেত্রে অনেক ইতিহাসবিদ সরাসরি বলেই দিয়েছেন এক্ষেত্রে জার্মানি পরাজিত হয়েছে বলে বিচার হয়েছে তাদের, ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের নামে হত্যা করা হয়েছে অগণিত কুশলী জার্মান সেনা নায়ককে। এদিকে মিত্রবাহিনী যদি পরাজিত হত তবে লন্ডন কিংবা মস্কোর রাস্তায় তেমনি তাদের অনেক বীর সেনানীর লাশ বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে ঝুললে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

সারাংশ

রণাঙ্গনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে অনেক উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণহানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বহুলাংশে। এই বিশ্বযুদ্ধ দেশ থেকে দেশ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাদেশ থেকে মহাদেশে। অন্যদিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাগরতল, মহাসাগর এমনকি অন্তরীক্ষেও চলেছিল প্রাণঘাতী সংঘাত। ৬১ দেশের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অংশগ্রহণে এ যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ৬ বছরের মত। লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান পরামানবিক বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। ১৯৪৫ সালে জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।